জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং ১৭, ৪র্থ বর্ষ, ৩০শে জুন, ১৯৯৪ বৃহস্পতিবার

THE JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbattya Chattagram Janasamhati Samiti (JSS)

Issue—17, 4th year, 30 th June, 1994 Thursday,

সম্পাদকীয়

জুম্ম জনগণ আজ রাজনৈতিক নিপীড়নের সাথে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সামরিক জান্তাই এই সাম্প্রদায়িকতার প্রধান হোতা। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তারা এই সাম্প্রদায়িক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপে পার্বত্য জনগণ আজ জুম্ম-অজুম্ম এই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। নিছক সাম্প্রদায়িক আক্রমণের লক্ষ্যে এই বর্ণগত বিভাজন করা হয়েছে। তাই আক্রমণের সময় চাকমা—মারমা—ত্রিপুরা ইত্যাদি হিসেবে কোন বাচবিচার পরিলক্ষিত হয়নি। সকল ক্ষেত্রে দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণই ছিল আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

বিগত দেড় দশকের সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীতে অনুপ্রবেশকারীরাই প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর (সেনাবাহিনী, বি ডি আর, আনসার ও ভিডি পি) প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তারা ১১টি হত্যাকাণ্ডে জুম্ম নরনারীকে হত্যা, শতশত গৃহ, বিহার ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেছে। পূর্ব পুরুষের বাস্তুভিটা থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ করে ভূমি বেদখল এবং জুম্ম জনগণকে স্বীয় জন্মভূমি থেকে বিতাড়নই তাদের এই সাম্প্রদায়িক আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

আর জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাই ছিল প্রধান উস্কানিদাতা। বিভিন্ন ঘটনায় তারা অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে ও কতকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা দিয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনরত শান্তিবাহিনীর তথা জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে প্রতিশোধ হিসেবে জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর বার বার সাম্প্রদায়িক আক্রমণ চালানো হয়েছে। জুম্ম সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে ধ্বংস করাই ছিল এসব আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও জুম্ম

জনগণ সাম্প্রদায়িক শাসন ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। বেসামরিক প্রশাসনে সকল উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা হলেন বহিরাগত। তাই প্রশাসন, উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেও জুম্ম জনগণ সাম্প্রদায়িক বঞ্চনা ও শোষণের শিকারে পরিণত হয়ে চলেছে।

বর্তমান বি এন পি সরকারের আমলে এই সাম্প্রদায়িকতা আরো নবরূপ ধারণ করেছে। জুম্ম ছাত্র-জনতার সকল গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকারকে এই হীন সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে রোধ করার প্রচেষ্টা চলছে। তাই পাহাড়ী গণপরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিপরীতে গড়ে তোলা হয়েছে পার্বত্য গণপরিষদ ও বাঙালী সমন্বয় পরিষদ। জুম্ম ছাত্র-জনতার মিছিলের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ চালানো এবং সাম্প্রদায়িক সংগঠনসমূহের লক্ষ্য। লাশ নিয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামে মিছিল ও নানিয়ারচর হত্যাকাণ্ড সবই হচ্ছে এই অভিনব সাম্প্রদায়িকতার ফলশ্রুতি

আজ এটা স্পষ্ট যে, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সকল প্রকার রাজনৈতিক নিপীড়নের সাথে বর্ণগত ও জাতিগত হিংস্রতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এই বর্ণগত ও জাতিগত আক্রমণের জন্য অনুপ্রবেশকারীদেরকে জুম্ম জনগণের উপর লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে। বলাই বাহুল্য যে এসব অনুপ্রবেশকারীরা আজ জুম্ম শরণার্থী প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানেরও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করতে মূলত জুম্ম জনগণকে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, মানবতাবাদী সংস্থা, ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী সমাজ ও প্রতিটি সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদ বিরোধী সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধই এর যথার্থ উপায়। এছাড়া জেলা প্রশাসনের সাম্প্রদায়িক শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে জুম্ম জনগণের প্রশাসনিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সর্বোপরি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতাসহ সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান।

সাম্প্রদায়িকতা ও জুম্ম জনগণ

শ্রী জগদীশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ আজ চরমতম সাম্প্রদায়িকতার শিকার হচ্ছে। এখানে প্রতিদিন ঘটছে সাম্প্রদায়িক অত্যাচার, নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যা। বিগত বিশ বৎসরের এমন কোন ঘটনা নেই, যা অসাম্প্রদায়িক বলা যায়। বস্তুতঃ এখানে সরকারী ও সেনাবাহিনীর প্রত্যেকের মদতে অনুপ্রবেশকারী ও বহিরাগতদের দ্বারা এ সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে জুম্ম জনগোষ্ঠীকে সর্বাত্মকভাবে ধ্বংস ও নির্মূল করার প্রচেষ্টা চলছে।

এটা অবিদিত যে, জুম্ম জনগোষ্ঠীই পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। শরণাতীতকাল হতে জুম্ম জনগণ এখানে বসবাস করে আসছে। ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের সময় জুম্ম জনগোষ্ঠীর হার ছিল ৯৭½% জন। কিন্তু এই জুম্ম ও অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলটি অবাঞ্ছিতভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে পরবর্তী বছরগুলোতে অজুম্ম (অপাহাড়ী) ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনুপাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কালক্রমে এই অজুম্মদের (অপাহাড়ী) অনুপাত ১৯৫১ সালে ৯% ১৯৬১ সালে ১৪%, ১৯৬৮ সালে ২৪%১৯৮১ সালে ৪১% এবং বর্তমানে ৫০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দেখা যায় ১৯৪৭ সালের পর হতে বৃহত্তম জুম্ম জনগোষ্ঠীর বিপরীতে বহিরাগত অজুম্মদের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই বৃদ্ধি ছিল অনাকাঙ্খিত অনুপ্রবেশ হেতু অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। ফলস্বরূপ তাদের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি জুম্ম ভূমির উপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই দুই সম্প্রদায় একই ভূমির দুই প্রান্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হয়। শুরু হয় ভূমি বিরোধ। এতে জুম্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় জুম্ম জনগণ শুরু করে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। আর এই জুম্ম জাতির সংগ্রাম দমনের নামে সাম্প্রদায়িক সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা এগিয়ে আসে। শুরু হয় জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ।

ভারত বিভক্তির আইনকে পদদলিত করে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলতঃ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে জুম্ম জনগণ পাকিস্তানের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয় এবং পুরো পাকিস্তানের আমলটি চরম অবহেলা, বঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। এ সময় কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ভেঙে দেয়া হয় এবং ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে তুলে দিয়ে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানোর পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূমি বন্দোবস্তি, উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে জুম্ম জনগণ চরম বঞ্চনার শিকার হয়। বলা বাহুল্য যে, পশ্চিম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক যেখানে সংখ্যাগুরু বাঙালী জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে সেখানে এই ক্ষুদ্র, অনুন্নত ও পশ্চাদপদ জুম্ম জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা তো অকল্পনীয়।

বাংলাদেশে অভ্যুদয়ের সাথে সাথে জুম্ম জনগণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চনার পাশাপাশি চরম সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হতে থাকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ লগ্নে দিঘীনালায় (৮ই ডিসেম্বর' ৭১) ও পানছড়িতে (১৯শে ডিসেম্বর'৭১) দুটি গণহত্যার শিকার হয়। এ গণহত্যার পেছনে কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল না, ছিল সাম্প্রদায়িক কারণে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। অবশ্য অনেকে মনে করেন, চাকমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকার জন্য এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। যেহেতু চাকমা রাজা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেন এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে পলায়ন করেন।

কিন্তু চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় এর পাকিস্তান পক্ষাবলম্বনের জন্য চাকমা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভাবার কোন যুক্তি নেই। তদুপরি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ত্রিদিব রায় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোন সংগঠন গড়ে তুলেননি। তিনি ছিলেন তৎকালীন জুম্ম জনগণের অন্যতম নেতা এবং চাকমা রাজা। তাই

সেই সময়ে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করতে তার কোন বেগ পেতে হয়নি। ১৯৭০এর নির্বাচনে একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। আর ত্রিদিব রায়ের পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনের সাথে দিঘীনালা ও পানছড়ি জুম্মদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও এভাবে জুম্মদের প্রাণ দিতে হয়েছে। তদুপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী কোন ভূমিকা পালন করেননি। বরঞ্চ বলা যায় ব্যাপকভাবে না হলেও অনেক চাকমা যুবক মুক্তি যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরবর্তী ঘটনাবলী একই ধারায় প্রবাহিত হয়। শুরু হয় জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ। সকল সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে জুম্ম জনগণকে বঞ্চিত করা হয়। এ সময় রাজাকার, মুজাহিদ প্রভৃতি মিথ্যা অভিযোগে জুম্ম যুবকদেরকে পাইকারীভাবে ধরপাকড়, নির্যাতন ও জেল-হাজতবাস দেয়া হয়। অপরদিকে হাজার হাজার অজুম্ম (অ-পাহাড়ী) পার্বত্য চট্টগ্রাম অনুপ্রবেশ করে জুম্মদের ভূমি বেদখল করতে শুরু করে। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মামলায় জড়িত করে নিরীহ জুম্মদেরকে তাদের নিজ বাস্তভিটা ও ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে থাকে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে সরকারী উদ্যোগে ভিন লক্ষাধিক অজুম্মকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়। এই অজুম্মরা ভি ডি পি, পুলিশ বি ডি আর ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে সংঘটিত করে বিভিন্ন গণহত্যা। শত শত জুম্ম গ্রামে অগ্নিসংযোগ করে জুম্মদের উচ্ছেদ করে। জুম্ম জনগণ ও শান্তিবাহিনীর প্রতিরোধ ও আক্রমণের প্রতি আক্রমণ হিসেবে চালানো হয় চরম সাম্প্রদায়িক আক্রমণ।

১৯৮৬ সাল ছিল জুম্মদের জীবনে সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ বছর। এ বছরেই গৃহযুদ্ধোত্তর অনুপ্রবেশকারী ও সেনাবাহিনীর উপর সবচেয়ে বেশী সশস্ত্র আক্রমণ চালায় শান্তিবাহিনী সদস্যরা। শান্তিবাহিনীর এই আক্রমণের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সাম্প্রদায়িক আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। বস্তুত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এরূপ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এপ্রিলের শেষের দিকে শান্তিবাহিনীর আক্রমণে ২৪ জন অনুপ্রবেশকারী নিহত হলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্ফোরণ ঘটে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অনুপ্রবেশকারীরা খাগড়াছড়ি-পানছড়ি মাটিরাঙ্গায় চালায় ব্যাপক গণহত্যা। এ গণহত্যায় ৫০ জন নিহত ও ৮৬ জন জুম্ম নিখোঁজ হয়। রামগড়, মাটিরাঙ্গায়, মহালছড়ি, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি ও দিঘীনালা থানায় শত শত জুম্ম গ্রাম, বৌদ্ধ বিহার, মন্দির জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এসব এলাকার ভীত সন্ত্রস্ত জুম্মরা বনে-জঙ্গলে ও ৫০ হাজার জুম্ম নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই পঞ্চাশ হাজার জুম্ম নরনারী ভারতে আশ্রয় গ্রহণের পর বিশ্বের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, সংগঠন ও সরকারসমূহ বাংলাদেশের উপর মানবাধিকার লংঘনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এতে বাংলাদেশ সরকার কিছুটা নমনীয় হতে বাধ্য হয়। এই আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বাংলাদেশ সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে সংলাপ (২য়-৬ষ্ঠ) ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বশাসন প্রদানের নামে বিভাজন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা করে। একদিকে সমস্যার সমাধানের নামে জনসংহতি সমিতির সাথে সংলাপ অন্যদিকে জুম্মদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে এবং জুম্মদের বিরুদ্ধে অজুম্মদেরকে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয় তৎকালীন সামরিক জেনারেলরা। এ সময় পুর্বাসিত অনুপ্রবেশকারীদেরকে সামরিক অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং সাম্প্রদায়িক ঘাতকবাহিনী ভি ডি পি বাহিনী সংগঠিত করা হয়।

অবশেষে ১৯৮৯ সালের প্রথম দিকে জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের সংলাপ ভেঙ্গে গেলে সরকার তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ বাস্তবায়নের জোর কার্যক্রম শুরু করে। এ বছরের জুন মাসে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করে বাংলাদেশ সরকার বিভাজন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কিছুটা সফলতা অর্জন করে। এই জেলা পরিষদ নির্বাচন বর্জন করে আরো বিশ হাজার জুম্ম নরনারী ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলে জুম্ম জনগণও জেলা পরিষদ প্রশ্নে দু'শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে সামরিক অফিসাররা জুম্ম জনগণকে পারস্পরিক বিভাজনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে এবং সরকারী প্ররোচনা ও অর্থানু-

তুলো সৃষ্টি করে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন। উগ্রদের মাঝে একটি সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে এইসব সংগঠন গঠিত হয়। এসব সংগঠনগুলো হচ্ছে—

(১) মারমা উন্নয়ন সংসদ ;

(২) ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ ;

(৩) চাকমা কল্যাণ সংসদ ;

(৪) প্রত্যাগত শান্তিবাহিনী কল্যাণ সংসদ ;

(৫) গণপ্রতিরক্ষা বাহিনী।

জুম্ম জনগণের মধ্যে বিভেদ অনৈক্য সৃষ্টি করে কাটা দিয়ে কাটা তোলার লক্ষ্যে এসব সংগঠন অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়। অপরদিকে অজুম্মদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় বাঙালী কৃষক-শ্রমিককল্যাণ পরিষদ, পার্বত্য গণ পরিষদ, বাঙালী সমন্বয় পরিষদ। জুম্মদের বিরুদ্ধে অজুম্মদের সংগঠিত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করাই এসব সংগঠনের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে জুম্ম সংগঠনগুলি আপামর জুম্মদের মধ্যে তেমন সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারলেও এসব অজুম্ম সংগঠনগুলি অজুম্ম জনসাধারণকে পুরো-পুরিভাবে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা ও উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে। এই সংগঠনগুলির প্রচারিত লিফলেট, দাবীনামায় সাম্প্রদায়িকতার পূর্ণ স্ফুরণ ঘটেছে !

বর্তমান গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়া সরকারের আমলে অজুম্মদের সাম্প্রদায়িকতা এক নব পর্যায়ের সূচনা করেছে। এই অজুম্ম সম্প্রদায় বর্তমানে সশস্ত্র ভিডিপি বাহিনী গঠন করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে জুম্মদের বিপরীত ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। জুম্ম ছাত্র-জনতার বিরোধীতাই যেন তাদের প্রধান লক্ষ্য। জুম্ম ছাত্র-জনতার কোন দাবী বা বক্তব্য যতই ন্যায্য হোক না কেন তার বিরোধীতা করাই হচ্ছে যেন তাদের আসল কাজ। তাই অজুম্ম সম্প্রদায় আজ জুম্মদের স্বায়ত্ত শাসন দাবীর বিপরীতে চায় সাম্প্রদায়িক শাসন, সেনা অপসারণের বিপরীতে চায় সেনা শাসন, গণতন্ত্রের বিপরীতে স্বৈরতন্ত্র, জুম্ম কোটার বিপরীতে পার্বত্য কোটা, ধর্ম নিরপেক্ষতার বিপরীতে ইসলামী মৌলবাদীত্ব। এ বিরোধীতার লক্ষ্যে গড়ে তুলেছে পাহাড়ী (জুম্ম) ছাত্র পরিষদের বিপরীতে পার্বত্য ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী (জুম্ম) গণ পরিষদের বিপরীতে পার্বত্য গণ পরিষদ। সর্বোপরি জুম্ম সম্প্রদায়ের বিপরীতে ইদানিং সৃষ্টি করেছে বাঙালী সমন্বয় পরিষদ।

এতদ্‌সঙ্গে জুম্ম-ছাত্র-জনতার দাবীদাওয়া ও আন্দোলনের বিপরীতে অজুম্মদের বিরোধী কার্যক্রমের কিছু উদাহরণ দেয়া গেল।

১) ১৯শে ডিসেম্বর' ৯১ ঢাকায় পাহাড়ী (জুম্ম) ছাত্র পরিষদ ৫ দফা দাবী নিয়ে এক সমাবেশ করে। পাহাড়ী (জুম্ম) ছাত্র পরিষদের এই সমাবেশ ও ৫ দফা দাবীর বিরোধিতায় সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অজুম্মরা হরতাল পালন করে। আর ২৩—২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় পার্বত্যবাসীদের সংমার্চ নামে ঢাকায় প্রহসনমূলক সংমার্চও সমাবেশ করে]

২) ২০শে মে'র ৯২ পাহাড়ী (জুম্ম) ছাত্র পরিষদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে জুম্ম ছাত্রদের মিছিল ও সমাবেশের বিরুদ্ধে অজুম্মরা পাল্টা মিছিল ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে। এই দাঙ্গায় ১৭ জন জুম্ম আহত হয় ও শতাধিক জুম্ম গৃহে অগ্নি-সংযোগ করা হয়।

৩) ১৩ই অক্টোবর'৯২ দিঘীনালায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত পাহাড়ী (জুম্ম) ছাত্র-জনতার বিপরীতে অজুম্ম ছাত্র ও অনুপ্রবেশকারীরা পাল্টা মিছিল ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে। এতে বরদাস মুনি চাকমা (৪০) নিহত ও শতাধিক জুম্ম আহত হয়।

৪) ১৩ই অক্টোবর' ৯৩ বরদাস মুনি চাকমার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সমাবেশের বিপরীতে বেতছড়িতে অজুম্মরা ৫ জন বাঙালী আহত, ২জন অপহৃত হওয়ার প্রতিবাদে এক সমাবেশ করে। (পার্বতী, ১৫ই অক্টোবর'৯৩)

৫) ১০ই নভেম্বর'৯৩, রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ১০ম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠানের পাল্টা হিসেবে অজুম্ম ছাত্ররা শহীদ নুর হোসেন দিবস পালন করে। এ অনুষ্ঠানে কিন্তু শহীদ নুর হোসেনের স্মৃতিচারণের চেয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও শান্তিবাহিনী বিরোধী বক্তব্যই প্রাধান্য পেয়েছিল।

৬) ১৭ই নভেম্বর'৯৩,নানিয়াচর বাজারের লক্ষ্ম ঘাটপারী ছাউনি থেকে সেনা পোস্ট অপসারণের দাবীতে পাহাড়ী ছাত্র-জনতার মিছিল ও সমাবেশের বিপরীতে পার্বত্য গণ-

পরিষদ পাল্টা মিছিলের আয়োজন ও গণহত্যা সংঘটিত করে। এ গণ হত্যায় শতাধিক জুম্ম নিহত ও ৫ শতাধিক আহত হয়।

৭) এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বাঘাইছড়ি থানা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দুইদিনের বাজার ও সরকারী অফিস বর্জনের বিপরীতে পার্বত্য গণ পরিষদ ৩ দিনের জন্য জুম্মদের নিকট মালামাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়।

(৮) ৭ই জানুয়ারী' ৯৪ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকায় সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদানের বিপরীতে পার্বত্য গণ পরিষদের ভাড়াতে লোক নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পুন: স্মারকলিপি প্রদান।

(৯) ৮ই জানুয়ারী' ৯৪, নানিয়াচর গণহত্যার প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও জাতীয় যুব সংগঠনসমূহ ঢাকা থেকে লংমার্চ করে নানিয়াচরে এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল ও গণ সমাবেশের প্রয়োজন করে। জুম্ম ছাত্র-জনতার এই লং মার্চের বিপরীতে বাঙালী সমন্বয় পরিষদ ও পার্বত্য গণ পরিষদ ১৪ই জানুয়ারীতে এক লং মার্চের' আয়োজন করে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো ছাড়াও দেখা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে অজুম্মরা জুম্ম ছাত্র-জনতার প্রতিটি মিছিল ও সমাবেশের পাল্টা মিছিল ও সমাবেশ করেছে। এরূপ পাল্টা মিছিল করে দাঙ্গা সৃষ্টিই হচ্ছে তাদের প্রধান অপচেষ্টা। আর স্থানীয় পুলিশ, ভিডিপি, বিডি আর ও সেনাবাহিনীই এরূপ পাল্টা মিছিল ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানোর প্রধান উস্কানিদাতা।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে জড়িত। তাই সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে জুম্ম সম্প্রদায়কে দমন ও পীড়নই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে বাংলাদের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পুলিশ, ও পুলিশ কর্মকর্তা,, বিডি আর ও সেনা সদস্য অজুম্ম (অপাহাড়ী) সম্প্রদায় থেকে নিয়োগ করেছে। অথচ জুম্ম সম্প্রদায়ের অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, পুলিশ কর্মকর্তা ও সেনা অফিসার বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় কর্মরত রয়েছেন। তাদেরকে কোন কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োগ করা হয়নি। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, জুম্ম সম্প্রদায় থেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আই-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োগ করা হলে জুম্ম জনগণ আজ এরূপ চরম সাম্প্রদায়িকতার শিকার হোতোনা।

দেশের প্রশাসনের ক্ষেত্রে যারা রক্ষক তারা যদি ভক্ষক হয়, তাহলে জনসাধারণের বাঁচার কোন উপায় থাকেনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অবস্থাও আজ তাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ জুম্ম জনগণের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। বিগত দেড় দশকের ঘটনায় এটা প্রমাণিত যে, প্রশাসনিক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যরাই জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক হামলায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং অনুপ্রবেশকারীদের লেলিয়ে দিয়ে গণহত্যা সংঘটিত করেছে। তাই জুম্ম জনগণ আজ বিদেশের মাটিতে ও দেশের অন্যান্য জেলায় নিজেদের নিরাপত্তা খুঁজতে ব্যস্ত। কিন্তু নিছক সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে কি একটি প্রতিষ্ঠিত গণচেতনাকে ও গণ আন্দোলনকে ধ্বংস করা সম্ভব? একটি জাগ্রত জাতিকে ধ্বংস করা সম্ভব? এর উত্তরে বলা যায় 'না' সম্ভব নয়। যেমন হিটলার ইহুদী জাতিকে ধ্বংস করতে পারেনি। আর তেমনি প্যালেস্তানীরা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় জুম্ম জনগণকেও সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে ধ্বংস করা সম্ভব নয়।

সংবাদ

কলিকাতায় বিক্ষোভ ও সমাবেশ

কলিকাতা, ৭ই মার্চ, গত ৬ই মার্চ যোগক্ষেম নামক এক সমাজসেবামূলক সংস্থার উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্সটিটিউট হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বিষয়ক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার হিউম্যান রাইট্স ডকুমেন্টেশন সেন্টার, হিউম্যানিটি প্রোটেকশন ফোরাম, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি এবং পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল থেকে বহু চাকমা নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।

এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন—ভারতের লোকসভার বিরোধী দলীয় নেতা শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, লোকসভার সদস্য শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি শ্রীরাজেশ চক্রবর্তী, দক্ষিণ এশিয়ার ডকুমেন্টেশন সেন্টারের পরিচালক শ্রী রবি নায়ার, হিউম্যানিটি প্রোটেকশন ফোরামের (আগরতলা) সভাপতি শ্রী ভাগ্য চন্দ্র চাকমা ও যোগক্ষেম এর সভাপতি শ্রী (ডাঃ) সঞ্জিৎ বরু প্রমুখ। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘন ও পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উপর বক্তারা সবিশেষ আলোচনা করেন।

এছাড়া সম্মেলনের পূর্বদিন (৫ই মার্চ) মহানগরীর ব্যস্ততম এলাকা চৌরঙ্গী এ্যাসপ্লেণ্ডের চত্বরে ৬ ঘন্টা ব্যাপী এক বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করা হয়। এই মিছিলে জুম্ম মেয়েদের থালি ও পিনলের উপর লেখা বিভিন্ন শ্লোগান ও ফেস্টুন টাঙানো হয়। তদুপরি জুম্ম জনগণের উপর সংঘটিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের উপর একটি ছবি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এইসব ছবিগুলি যোগদানকারী প্রতিনিধিদের মনে গভীর আবেদন জানাতে সক্ষম হয়।

ব্রিটিশ সাংবাদিকের লালিয়াচর সফর

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারীতে লণ্ডনের 'দি ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট' পত্রিকার দক্ষিণ এশিয়ার সংবাদদাতা মিঃ টিম ম্যাক গার্ক (Tim MC Girk) লালিয়াচর সফর করেন। এদিন তিনি হেলিকপ্টার যোগে লালিয়াচর আসেন এবং দু'ঘন্টা অবস্থান করেন। তিনি এ সফরকালে লালিয়াচরের বিভিন্ন বেসামরিক ও সামরিক অফিসার এবং জুম্ম-অজুম্ম নেতৃবৃন্দের সাথে কথাবার্তা বলেন। তিনি এ সময়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের লালিয়াচর শাখার সহ-সভাপতি শ্রীশুন মনি চাকমার সাথে বিশেষভাবে ঘটনার বিষয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে তিনি যাত্রী ছাউনী থেকে পলায়নরত সেনা সদস্যদের ছবি তুলেন। এই সেনা সদস্যরা তাকে দেখে যাত্রী ছাউনির চেকপোষ্ট ছেড়ে পালাচ্ছিল।

জুম্ম ছাত্রাবাস বন্ধ ঘোষণা

বান্দরবান জেলায় একটি জুম্ম ছাত্রাবাস বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে ১২৫ জন জুম্ম ছাত্রের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

বান্দরবান জেলায় পশ্চাদপদ জুম্ম ছাত্রদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে এই ছাত্রাবাসটি। ১৯৮৩ সনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছাত্রাবাসটি জেলা প্রশাসনের অধীনে ও বান্দরবান সরকারী হাই স্কুলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু কোন কারণ ছাড়া গত ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে ছাত্রাবাসটি বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। এতে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের ১২৫ জন জুম্ম ছাত্রের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিনা কারণে ছাত্রাবাসটি বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে ৭ই ফেব্রুয়ারীতে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরা বান্দরবানে এক সমাবেশ করে এবং ছাত্রাবাসটি চালু রাখার দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের নিকট পেশ করে। বান্দরবান জেলা ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির জুম্ম ছাত্রদের এ দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং পৃথক পৃথক বিবৃতির মাধ্যমে জুম্ম ছাত্রাবাসটি চালু রাখার দাবী জানিয়েছে। বস্তুতঃ জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সংকোচন নীতির লক্ষ্যেই এই ছাত্রাবাসটি বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

জুম্ম হত্যার এক নগ্ন পরিকল্পনা

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দিঘীনালায় অনুপ্রবেশকারী পাড়া থেকে সামাদ (প্রকাশ-চাকমা বাঙালী) নামে এক অনুপ্রবেশকারী ধান ক্রয়ের নামে বড়াদম এলাকার জুম্ম পাড়ায় দিকে রওনা দেয়। কিন্তু সে ধান ক্রয় না করে বড়াদম থেকে রিক্সায় করে সোজা দিঘীনালার বাস স্ট্যাণ্ডে গিয়ে চট্টগ্রামগামী বাসে চড়ে চট্টগ্রাম রওনা দেয়। সেদিন বিকেল বেলা সে ঘরে ফিরে না আসাতে অনুপ্রবেশকারীরা জুম্মরা তাকে গুম করেছে বলে বিভিন্ন বক্তব্য ছাড়তে থাকে। ফলে সমগ্র এলাকাতে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তারা এর বদলে দিঘীনালা এলাকার জুম্মদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য সংগঠিত হয়ে এক নগ্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরের দিন অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারী জুম্ম নিধনের জন্য তারা প্রয়োজনীয় যানবাহনও মোতায়েত করে বলে জানা যায়। এই জুম্ম নিধন যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করার জন্য তারা প্রতিটি অনুপ্রবেশকারী অধ্যুষিত এলাকায় টেলিফোনে জল্লাদ বাহিনীদের আক্রমণ জানায়। ইতিমধ্যে তাকে বহনকারী রিক্সাচালকটি তার চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা প্রকাশ করে দিলেও উত্তেজিত অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীরা কিছুতেই শান্ত হ'তে চায়নি। ২৩ তারিখের সকাল বেলায় আলম নামে দিঘীনালা বাজারের এক দোকানদার চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে উক্ত সামাদকে চট্টগ্রামের কোন এক হোটেলে দেখে এসেছে বলে প্রকাশ করার পর উত্তেজিত বাঙালীরা তাদের নগ্ন পরিকল্পনা বানচাল করতে বাধ্য হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত সামাদ সরকারী গুদামের ধান ক্রয়ের জন্য গুদাম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করে ফেলে। সরকারী টাকা আত্মসাতের অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তার এই প্রচেষ্টা বলে জানা যায়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২য় বার্ষিক সম্মেলন

গত ১লা এপ্রিল' ৯৪ইং, বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়িতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় টাউন হলের সামনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং দলীয় সঙ্গীত পরিবেশনসহ পাহাড়ী গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য শ্রী কিরণ মারমা উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সকাল ৯টায় সংগঠনের শতশত জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী শহর প্রদক্ষিণ করে।

এরপর খাগড়াছড়ি শাখার সভাপতি ক্যাজরী মারমার সভাপতিত্বে টাউন হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের উদ্বোধক কিরণ মারমা, পাহাড়ী গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক দীপ্তি শংকর চাকমা, পাহাড়ী গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিশ্বজিৎ চাকমা, পাহাড়ী গণ পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি সাথোয়াই প্রু মারমা, সম্পাদক বোধিপ্রিয় চাকমা ও আরো অনেকে। বক্তারা পাহাড়ী জনগণের উপর দীর্ঘদিনের নিপীড়ণ ও নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন এবং বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বলেন যে, বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের মুখোশ পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের নামে একে একে উপহার দিচ্ছে লোগাং ও নানিয়াচরের মত নৃশংস গণহত্যা।

এছাড়া ফিরে আসা জুম্ম শরণার্থীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ না করা এবং নানছড়িস্থ উল্টাছড়িতে ফিরে আসা শরণার্থীদের স্ব-স্ব বাস্তুভিটায় ঘর উঠাতে না পারায় জন্যও বক্তারা সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

দাতাদেশ সমূহের কাছে ডগলাস স্যাণ্ডারের চিঠি

গত ১৯-২০ এপ্রিল'৯৪ ইং প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ এইড কনসোর্টিয়াম বৈঠকে দাতাদেশ সমূহের প্রতিনিধিদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামে কমিশনের চেয়ারম্যান ডগলাস স্যাণ্ডারস এক চিঠি লিখেন। ৬ই এপ্রিলে লিখিত এই চিঠিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখার জন্য মিঃ স্যাণ্ডারস দাতাদেশ সমূহের কাছে অনুরোধ করেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যুদ্ধবিরতি বলবৎ থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘন এক নিত্য-

নৈমিত্তিক ঘটনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সমস্যার সমাধান সুদূর প্রসারী। রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ত্রিপুরাস্থ জুম্ম শরণার্থীদের প্রথম ব্যাচটিকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করা হয় বলেও তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম অউপজাতীয়দের ক্রমবর্ধমান পুনর্বাসন সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার অস্বীকার করলেও এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রয়েছে বলে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও উপজাতিয়দের দমন পীড়নের কাজে বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক সাহায্য কাজে লাগাচ্ছে। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামে এসব অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান স্থগিত রাখার জন্য তিনি দাতাদেশ সমূহের কাছে আবেদন জানান।

পাইকারী হারে জুম্ম মারধর

এ বৎসরের বিজু উৎসবের সপ্তাহখানেক আগে ৫ই এপ্রিল '৯৪ ইং তারিখে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ভাই বোন ছড়া এলাকার নিরীহ জনগণকে স্থানীয় সেনা সদস্যরা নির্মমভাবে পিটিয়ে জখম করেছে। ঘটনার সূত্রপাত ঘটে এভাবে ঘটনার আগের দিন অর্থাৎ ৪টা এপ্রিল তারিখে এলাবাসীকে বিনাবেতনে ক্যাম্পের কাজে হাজির হওয়ার জন্য সেনা সদস্যরা নির্দেশ দিয়ে আসে। কিন্তু ঐদিনে সকাল আটটার মধ্যে লোকজন ক্যাম্পে হাজির না হলে সেনা জোয়ানরা উক্ত গ্রামের ৩০ জন গ্রামবাসীকে পাইকারীভাবে মারধর করে আহত অবস্থায় ফেলে আসে। আহতদের মধ্যে কয়েকজন হলেন— (১) শ্রী মনমোহন ত্রিপুরা, (২) শ্রী ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা, (৩) শ্রী সুরেন্ত মোহন ত্রিপুরা (৪) শ্রী মানেন্দ্র ত্রিপুরা, (৫) শ্রী হুব রঞ্জন চাকমা প্রমুখ।

এখানেই শেষ নয়। জুম্মদের সবচেয়ে বড় উৎসব ফুল বিজুর দিন, ১২ই এপ্রিল রাঙ্গামাটি জেলার কুতুকছড়ি, ভুইয়া আদাম, জুরছড়ি হাজাছড়ি ও পুঁতিখালি সহ ব্যাপক এলাকায় সেনারা অপারেশন চালিয়ে লোকজনকে ঘরছাড়া ও গ্রাম থেকে বিতাড়িত করেছে। এই সব এলাকার নিরীহ অসহায় জুম্ম জনগণ প্রাণ বাঁচানোর জন্য বন বাঁদাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কাজেই হায়েনাদের আগ্রাসী অপারেশনে সেসব এলাকায় জুম্ম জনগণের পক্ষে এ বৎসরের বৈসাবি উদ্‌যাপন আর সম্ভব হয়নি।

প্যারিসে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ

গত ১৯শে এপ্রিল, প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ এইড কনসোর্টিয়াম বৈঠকে বাংলাদেশকে সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার দাবীতে বিশ্ব ব্যাংক অফিসের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভ মিছিলে ইউরোপের জুম্ম পিপলস্ নেট ওয়ার্ক, অর্গানাইজিং কমিটি, চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস্ ক্যাম্পেইন, ফ্রান্স ভিত্তিক ট্রাইবেল এ্যাক্টস্ সারভাইবেল ইন্টারন্যাশন্যাল এবং প্যারিস ভিত্তিক বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ফোরামের প্রতিনিধিসহ মোট ৭০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভকারীরা "পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা বন্ধ কর", "বাংলাদেশকে সাহায্য বন্ধ কর", "বৈদেশিক সাহায্য পার্বত্য সমস্যা জিইয়ে রাখতে সাহায্য করছে" প্রভৃতি লেখা সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন প্রদর্শন করেন। মিছিলকারীদের মধ্যে বাংলাদেশের হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ৩০ জন প্রতিনিধিও অংশগ্রহণ করেন, যাদের অনেকে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর জাতিগত নিপীড়ন নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিক্ষোভকারীরা দাতা সংস্থা দেশসমূহের প্রতিনিধিদের কাছে যৌথভাবে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেন। উক্ত স্মারকলিপিতে দাতা দেশসমূহ, বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছে আলাদাভাবে দাবী জানানো হয়। দাতা দেশসমূহের কাছে পার্বত্য সমস্যার সমাধান এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বৈষম্যমূলক নীতি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ ও সমতল ভূমি থেকে আগত বসতিকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সমতলভূমিতে তাদের স্ব-স্ব ভূমিতে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য বৈদেশিক সাহায্য মঞ্জুরীর জন্য আবেদন জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারের কাছে জুম্ম জনগণের জন্য আঞ্চলিক

বাস্তবায়ন, জুম্ম জনগণের ক্ষমতা ক্ষেত্র প্রদান, সাবধারি-কার সংঘবদ্ধ বন্ধসহ অন্যান্য দাবী জানানো হয়। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে যৌথভাবে দাবী জানানো হয়েছে যে, শরণার্থীদের যেন জোরপূর্বক ফেরত না পাঠানো হয় এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন কর্মসূচীতে ইউ, এন, এইচ, সি, আর এবং আই, সি, আর, সিকে জড়িত করার দাবী জানানো হয়েছে।

শান্তিবাহিনীর সদস্যের নাম দিয়ে ইউরোপে বাঙালীর রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের আবেদন

সম্প্রতি বাংলাদেশের শান্তিবাহিনীর সদস্য, এমনকি চাকমা উপজাতি নাম দিয়ে ইউরোপীয়ান দেশসমূহে বাংলাদেশের অনেক বাঙালীর রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের আবেদন নিয়ে এক রহস্যজনক গুঞ্জন উঠেছে। বিশেষ এক সূত্রে জানা যায় যে, এমনসব কতিপয় বাঙালী সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েও গেছে। চাকমা উপজাতি এবং শান্তিবাহিনীর সদস্য নামধারী কয়েকজন বাঙালীর সুইজারল্যাণ্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে পরে তারা ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের জন্য আবেদন করে বলে জানা যায়। এসব ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু উপজাতিরা সত্যি সত্যি বাংলাদেশ সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে। আর এরই সুবাদে উল্লেখিত বাঙালীরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভে সুযোগ নিচ্ছে।

শরণার্থী প্রতিনিধিদলের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর

১৫-২২শে ফেব্রুয়ারী '৯৪ইং ত্রিপুরার জুম্ম শরণার্থী শিবির থেকে প্রথম ব্যাচের প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গত ২৫শে এপ্রিল—২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত শরণার্থী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি শ্রী উপেন্দ্রলাল চাকমার নেতৃত্বে ১১ সদস্যক শরণার্থীদের এক প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসেন। শরণার্থী প্রতিনিধিদলের সাথে ত্রিপুরার ৩জন কর্মকর্তা —(১) দক্ষিণ ত্রিপুরার ডি এম চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, (২) সাব্রুম মহকুমা প্রশাসক সুখরাম দেববর্মা ও (৩) অমরপুর মহকুমা প্রশাসক এস, কে রাকেশও ছিলেন। ৫ দিনের এ সফরে প্রতিনিধিদলটি পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা, মাটিরাঙ্গা, রাঙ্গামাটি, লংগদু বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধি দলটি প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও সাধারণ উপজাতীয়দের কাছ থেকে পুনর্বাসন ও বহিরাগত এবং নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা জুম্মদের জমি জবরদখলের অনেক অভিযোগ পান বলে জানা যায়। সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত ১৬ দফা বেনিফিট প্যাকেজের ৩/৪টি ছাড়া অন্যান্য সব প্রতিশ্রুতি অপূরণ রয়েছে বলে প্রতিনিধি দলটি প্রত্যক্ষ করেন। সফরের সময় প্রতিনিধিদলটি সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ষড়যন্ত্রমূলক ১২ দফার এক বেনিফিট প্যাকেজ (স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত) প্রাপ্ত হন, যা পূর্বে প্রদত্ত ১৬ দফা বেনিফিট প্যাকেজের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন বলে প্রতিনিধিদলের প্রধান শ্রীচাকমা অভিযোগ করেন। প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৯২টি পরিবার নিজ বাস্তুভিটায় যেতে পারছেনা বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

সফর শেষে ত্রিপুরা ফেরার পথে ২৯শে এপ্রিল মানিকছড়ি থানা মিলনায়তনে সকাল ১১টায় প্রত্যাগত শরণার্থী ও সুধী সমাবেশে প্রতিনিধিদলের প্রধান শ্রীচাকমা এক বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, পেশকৃত দাবীনামার মধ্যে সরকার মাত্র ৩/৪টি দফা বাস্তবায়ন করে থাকলেও সেগুলো সরকারের সরাসরি প্রতিশ্রুতি নয়। তিনি উদাহরণ টেনে বলেন—যেমন সরকার পারিবারিক অন্যান্য খরচ স্বরূপ ৫ হাজার টাকা প্রদানের কথা উল্লেখ করেছে। দ্বিতীয় দফায় শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি ত্রিপুরায় গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে সফরকালীন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য বৈঠকে বসা ছাড়া মতামত ব্যক্ত করতে অপারগতা দেখান। জে, এস, এস, এর সাথে সরকারের সংলাপের অগ্রগতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উপরই ২য় দফায় শরণার্থী প্রত্যাবাসনের বিষয়টি নির্ভর করছে বলেও শ্রী চাকমা অভিমত ব্যক্ত করেন।

সরকার ও জনসংহতি সমিতির ৭ম বৈঠক

গত ৫ই মে বাংলাদেশ সরকারী কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকটি ছিল সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত বৈঠক। এদিন যথারীতি জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে দুধকুছড়া থেকে হেলিকপ্টার যোগে খাগড়াছড়ি নিয়ে আসা হয়। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে দু'পক্ষই অল্প সময়ের জন্য আনুষ্ঠানিক আলোচনায় মিলিত হন।

এ বৈঠকে সরকারী পক্ষ পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫ দফার উপর সরকারী ও বিরোধী দলীয় মতামত আলোচনায় ব্যর্থ হলে আনুষ্ঠানিক আলোচনার অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় কোন অগ্রগতি ছাড়াই আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে উভয় পক্ষের আলোচনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি ও সরকার পক্ষের ৪ জনের এক সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিন বিকাল ২টা নাগাদ বৈঠক শেষে উভয় নেতা পৃথক পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিং এ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। প্রেস ব্রিফিং-এ জে, এস, এস, নেতা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণের দাবীকে সরকার বাস্তবায়ন করছে না বলে অভিযোগ করেন। এর উদাহরণ স্বরূপ বলেন—পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদটি এখনো জি ও সি, চট্টগ্রামের দখলে রয়েছে। স্থানীয় সরকার পরিষদ সম্পর্কে বলেন যে, পার্বত্য জনগণ এ পরিষদকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তবুও যদি জোরপূর্বক এই পরিষদ চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে কোন কিছু করার নেই। তিনি জুম্মল্যান্ড সম্পর্কে বলেন—"জুম্মল্যান্ড" মানে আলাদা রাষ্ট্রের দাবী নয়, শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের জায়গায় "জুম্মল্যান্ড" নাম দেয়া হবে। কাজেই নাম সম্পর্কে কারোর ভুলভ্রান্তি থাকার কথা নয়। সংশোধিত ৫ দফা সম্পর্কে বলেন যে, এ দাবীনামার মাধ্যমে পার্বত্য জনগণ কোন প্রকার পৃথক রাষ্ট্রের দাবী করছে না, শুধুমাত্র বাংলাদেশের সার্বভৌমের মধ্যে থেকে গণতান্ত্রিকভাবে ভূমির অধিকার দাবী করেছেন পার্বত্য জনগণ। তিনি শরণার্থীদের সম্পর্কে বলেন, এ ব্যাপারে জে, এস, এস, এর প্রত্যক্ষ কোন হাত নেই, এটা ভারত ও বাংলাদেশ—দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বলে জে, এস, এস, নেতা উল্লেখ করেন। তবে পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এসব শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন নিরাপদ নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। কারণ উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় লড়াই শুরু হবে এবং তখন কারোর পক্ষে নিরাপত্তা থাকবে না বলে উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি সংশোধিত ৫ দফা দাবীনামা জে, এস, এস, পরিবর্তন করবেনা বলে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মানবাধিকার কর্মীরা বিমুখ হলেন

প্রত্যাবর্তিত জুম্ম শরণার্থীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ, বসতিকারী মুসলমান বাঙালী এবং সর্বোপরি চট্টগ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দেখার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংগঠনের ৫ জন সদস্য ৫ই মে ঢাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শনে আসেন। এই মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ ৫ই মে'র ৭ম বৈঠকে অংশগ্রহণকারী জে, এস, এস, নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কি এক রহস্যজনক কারণে সরকারী কমিটির প্রধান, যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ জে, এস, এস, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদেরকে দেখা করতে দেননি বলে জানা যায়। জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘনের সুস্পষ্ট অভিযোগ ও প্রমাণাদি সংগ্রহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এই সাক্ষাতের অনুমতি না দেয়ার কারণ বলে বিজ্ঞ মহলের ধারণা।

সফরকারী প্রতিনিধিরা হচ্ছেন—(১) মিঃ এক্রাম হোসেন, পর্যবেক্ষক এবং রিপোর্টার, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, (২) এডভোকেট সালমা আলী, জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, (৩) এডভোকেট ইউ, এম, হাবিবুন্নেসা, আইন ও সালিশি কেন্দ্র, (৪) এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান, জাতীয় কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মানবাধিকার সংরক্ষণ কমিটি এবং (৫) মিঃ কামরুল হাসান, বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি।